লিভিংরুমটা বেশ বড়সড়, একাধিক সোফা দিয়ে সাজানো। মুখোমুখি সোফায় বসল দৌলত মিয়া। আরিফা দরজা বন্ধ করে লিভিংরুমের মুখে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, দৌলত তাকে নীরবে সরে যেতে বলল। আরিফা কয়েক পা সরে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। রহমত এক গাল হাসি নিয়ে বলল, "দৌলত সাহেব, এটা কি ধরণের ব্যবহার হল বলেন তো? আমার তো ধারনা ছিল আমরা বন্ধু মানুষ। হঠাৎ এই রকমের বৈরী আচরণ কেন বলেন তো? ফোন করছি ধরছেন না, বাসায় এসে বেল টিপছি দরজা খুলছেন না। আপনি তো এই ধরণের মানুষ না ভাই।"

দৌলত একটা চাঁপা নিঃশ্বাস ছাড়ল। "বলেন, কি সমস্যা হয়েছে?"

রহমতকে থামিয়ে দিয়ে এবার মিজান বলল, "আপনি জানতেন সমস্যা হবে, ঠিক বলেছি কিনা?"

দৌলত চাঁপা স্বরে বলল, "আমি আপনাদেরকে মেয়েটার খবর দিয়েছিলাম। বিয়ে করার আগে ভালো করে খোঁজ খবর নেয়াটা আপনার দায়িত্ব ছিল। এখন কোন সমস্যা হলে সেটা তো আমার দোষ না।"

মিজানের বুক ধুক পুক করছে। এই লোক নির্ঘাত কিছু জানে। ঠিক জায়গাতেই এসেছে তারা। সে লজ্জিত ভঙ্গীতে বলল, "ভাই, আপনাকে দোষারোপ করার জন্য আসি নি। বিপদে পড়েছি। আপনার সাহায্য চাইছি। মেয়েটি ভালো কিন্তু দু' একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। তার শরীরে অসম্ভব শক্তি। দুই তিনজন পুরুষ মানুষের চেয়েও বেশী। এতো রোগা একটা মেয়ের শরীরে এতো শক্তি কি করে হয়? শুধু শক্তি নয়, তাছাড়াও কি যেন একটা আছে ওর মধ্যে, স্বাভাবিক মনে হয় না। একসময় খুব ভালো, আরেক সময় অসম্ভব ক্ষ্যাপা। আমি তো ভাই কিছুই বুঝতে পারছি না।"

দৌলত মিয়া চশমা খুলে চোখ মুছছে। তাকে নীরব থাকতে দেখেই হয়ত আবার লিভিংরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল আরিফা। "ওকে আমরাও ভয় পাই। সবাই ভয় পায়। তখনই দৌলতকে বলেছিলাম এর মধ্যে না জড়াতে। *না, আমি মামা হই। ওর নানী মারা গেলে তখন কম বয়েসী মেয়েটা কোথায় যাবে? একটা দায়িত্ব আছে না?* এবার, দায়িত্ব পালন করছ?"

রহমত বলল, "ভাবী, আপনিও এসে বসেন না, প্লিজ! আপনি যা জানেন, আমাদেরকে বলেন। আমরা তো পুরো অন্ধকারে।"

আরিফা বসল না। বরং এক পা পিছিয়ে গিয়ে দৃষ্টি থেকে আধাআধি সরে গেল। দৌলত চশমাটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "আপনারা গ্রামে গিয়ে কারো সাথে একটু কথা বললেই জানতে পারতেন, জুলেখার জ্বীনের দোষ আছে।"

"জ্বী!" মিজান দৌলতের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে গেল।

"জ্বীন!" রহমত অবিশ্বাস নিয়ে বলল।

দেয়ালের ওপাশ থেকে আরিফা বলল, "ওর কাছে জ্বীন আছে। ও মানুষের ক্ষতি করতে পারে। রেগে গেলে ও কি করবে তার কোন ঠিক নেই।"

মাথা নাড়ল দৌলত। "আমার মনে হয় না ও কারো ক্ষতি করবে। কিন্তু জ্বীনকে দিয়ে অনেক কিছু করানো সম্ভব। আমি জানি, শুনতে অদ্ভুত লাগছে, কিন্তু যাদের এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে, তারা আপনাকে বলবে খুব সাবধান থাকতে।"

আরিফা দেয়ালের ওপাশ থেকে চাঁপা স্বরে বলল, "এসবের মধ্যে আমরা জড়াতে চাই না। আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যদি সমস্যা বেশী হয়, দেশে রেখে আসেন। আমাদেরকে বিরক্ত করবেন না। আমার একটা ছেলে আছে, তার কোন ক্ষতি হোক আমি চাই না।"
মিজান এবং রহমত কৌতূহলী হয়ে দৌলতের দিকে তাকাল। চশমাটাকে চোখে বসালো সে। "শোনেন, অনেকেই আছে যারা আমার কথা শুনে আমাকে পাগল ভাববে। বিজ্ঞানের যুগে কে কি বিশ্বাস করবে না করবে সেটা তাদের ব্যাক্তিগত ব্যাপার। আমি এবং আমার স্ত্রী ধর্মে বিশ্বাসী। জ্বীনের অস্তিত্বে আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাদের ক্ষমতায় আমরা বিশ্বাস করি। তারা ভালো কাজ করতে পারে, খারাপ কাজও করতে পারে। কিছু কিছু মানুষের শরীরে তারা বাস করে। ঐ মানুষগুলো অস্বাভাবিক ব্যাবহার করে। সব সময় না, মাঝে মাঝে। আমাদের ধারনা জুলেখার শরীরে একটা জ্বীন বাস করে। সে জন্যেই তার শরীরে এমন অসম্ভব শক্তি। অনেক ছোটবেলা থেকেই এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তাকে নিয়ে কোন সমস্যা কখন হয় নি। কিন্তু যেহেতু সবাই জানত তার উপর জ্বীনের আছর আছে, তাকে বিয়ে দেয়াটা কঠিন ব্যাপার হয়ে ওঠে। মিজান সাহেব, আপনার বন্ধু যখন প্রথম আমাকে বলে যে আপনি দ্বিতীয় বিবাহ করতে আগ্রহী, তখন জুলেখার কথা আমার মনে হয়। আগেই বলেছি, সে কখন কারো ক্ষতি করেছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং জেনে শুনে আপনার কোন ক্ষতি হোক এটা আমি চাই নি। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে গেছেন।"
মিজান কি বলবে ঠিক বুঝতে পারে না। জ্বীনের কথা সে পড়েছে। গ্রামে তার আদি বাস, সুতরাং জ্বীনের আছর হওয়া মানুষ সে দেখেছে। বিশ্বাস করা না করা নিয়ে কখন ভাবে নি। দৌলত ঠিকই বলেছে। ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই সব তার কাছে খানিকটা গল্পের মত শোনায়। এটা কি সত্যি হতে পারে?
রহমত বলল, "আমাদের তাহলে এখন কি করা উচিৎ?"
দৌলত অসহায় ভঙ্গীতে হাত নাড়ল। "আমি বলতে পারব না। কিন্তু, যাই করেন, সাবধানে করবেন। আমার জানা মতে তাকে নিয়ে কখন কোন মারাত্বক সমস্যা হয় নি। সুতরাং চেষ্টা করলে মিজান সাহেব হয়ত মানিয়ে নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। কিন্তু আমার পক্ষে এই ব্যাপারে কোন সাহায্য করা সম্ভব হবে না। আমার স্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস, জুলেখা চাইলে যে কারো ক্ষতি করতে পারে। দূরত্ব তার কাছে ব্যাপার নয়। আমাদের একটি ছেলে আছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। তার জীবনের কোন ঝুঁকি আমরা নিতে চাই না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মিজান সাহেবের ভয় পাবার কোন কারণ আছে।"
রহমত বাঁকা হেসে বলল, "আপনি একদিকে বলছেন আপনারা তাকে ভয় পান, আবার আরেক দিকে বলছেন আমার বন্ধুর তাকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কোনটা ঠিক?"
দৌলত কিছু বলল না। আরিফা বলল, "ভাই, আপনারা এবার আসেন। যা জানতে চেয়েছিলেন, জেনেছেন। আমাদের আর কিছু বলার নেই।"
মিজান এবং রহমত চোখাচোখি করল। শ্রাগ করল রহমত। মিজান উঠে দাঁড়াল। "আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভাবী। এই তথ্যটুকুর মূল্য অনেক। আপনাদেরকে

আপাতত আর বিরক্ত করব না। চল, রহমত। আসি, দৌলত ভাই।"
চুপচাপ গাড়ীতে চলে এলো দু'জন। নিঃশব্দে মিনিট পাঁচেক গাড়ি চালাল রহমত। তারপর বলল, "হুম! এই সম্ভাবনার কথা তো ঘুনাক্ষরেও ভাবি নি।"
মিজানকে দেখে মনে হল সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। কিছু বলল না।

মিজান গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো জুলেখা। দ্রুত হেঁটে সামনের জানালায় চলে এলো, বাইরে তাকিয়ে মিজানের গাড়ীটাকে যতক্ষন দেখা গেল তাকিয়ে থাকল। সামনের বাঁক ঘুরতেই গাছ পালার আড়ালে হারিয়ে গেল মার্সিডিজটা। থমথমে মুখে কিছুক্ষন সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে। নীচে নেমে এলো। সময় নিয়ে এক কাপ চা খেল। কিছুক্ষন বাইরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল। ডাগরকে তার দুই বাচ্চা সহ কোথাও দেখা গেল না। কি করবে ভাবছে জুলেখা। হাঁটতে হাঁটতে ওয়াল নাট গাছটার কাছে যাবে? পিচচীর সাথে দেখা হবে? পাগলাটা কোথায় কোথায় ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে কে জানে? মাটি এখনও অনেক ভেজা। এই মুহূর্তে কাদা মাটিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে না। সে আবার উপরে উঠে এলো। নায়লার ঘরের দরজায় সে আর তালা দেয় নি। দরজাটা ভিড়িয়ে রাখা। মিজান দেখেছে, কিছু বলে নি। আস্তে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। আলতো পায়ে ভেতরে ঢুকল সে। এক কোনে রাখা বিশাল একটা কাঁচের আলমারীতে তার চোখ আটকে গেল। সামনে গিয়ে পাল্লা খুলতে গিয়ে দেখল তালা লাগানো। দ্রুত গিয়ে চাবির গোছা নিয়ে এলো। আলমারী খোলা গেল। অনেক এলবাম। কম করে হলেও বিশটা। নিশ্চয় নায়লা সযত্নে তার সংসারের তাবৎ কিছুর ছবি সাজিয়ে রেখেছে। অনেক দিনের সংসার ছিল বেচারীর। নায়লার জন্য তার খারাপই লাগছে। কাঁচের বাইরে থেকে এলবামগুলো দেখার পর থেকেই ভেতরের ছবি দেখতে ইচ্ছে করছিল জুলেখার। মিজানের সাথে বসে দেখলে মন্দ হত না, কিন্তু মিজান হয়ত খুব একটা স্বস্তি বোধ করবে না।
এলবামগুলো নিয়ে মেঝেতেই বসে পড়ল জুলেখা। রঙ্গীন কালি দিয়ে বড় বড় করে বছর লেখা। কোনটাতে এক বছর, কোনটাতে একাধিক। সবচেয়ে পুরানোটা দিয়েই শুরু করল। বিয়ের ছবি। নায়লা তখন অনেক অল্প বয়স্ক। বিশ – বাইশের বেশী নিশ্চয় হবে না। দেখাচ্ছে আরও কম। মিজানকেও খুব বয়স্ক মনে হচ্ছে না। সেই সময়ে সে বেশ সুদর্শনই ছিল। এখন চুল টুল অনেক পাতলা হয়ে গেছে, শরীরটাও ভারী হয়ে গেছে। বয়েসের ছাপ তার প্রতিটি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, আচার আচরণে। পুরো এলবামটাই নায়লা আর মিজানের ছবি। বিয়ের অনুষ্ঠানের। বিয়ের পর আত্মীয় স্বজনদের সাথে। অধিকাংশ ছবিই রঙচটা। সময়ের চিহ্ন স্পষ্ট। একটার পর একটা এলবাম দেখতে থাকে জুলেখা। তৃতীয়টাতে গিয়ে পেল নায়লার প্রথম প্রেগনেন্সির ছবি। এই বাড়ীতে আসা অবধি মিজান তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোন কথা বলে নি। কোথাও সে তাদের কোন ছবিও দেখেনি। কিন্তু বিয়ের আগে তার নানীবু'র কাছে সে শুনেছিল মিজানের দুটি সন্তান আছে। নানীবু কোথা থেকে খবর পেয়েছিল কে জানে। মিজান বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত তার আগের সংসার নিয়ে কোন কথাই নিজ থেকে বলে নি। নায়লার প্রথম সন্তান একটি

ছেলে। তার শত শত ছবি - প্রথম হামাগুড়ি, হাঁটা, দৌড়ান, স্কুলে যাওয়া, ফুটবল খেলা ... বছর পাঁচ – ছয় পর্যন্ত তার বাবা মায়ের জীবনে বোধহয় আর কোন কিছুর প্রয়োজন ছিল না। খুব ঠান্ডা দর্শন নিরীহ প্রকৃতির একটি ছেলে, খুব সম্ভবত একটু লাজুক, কারণ অধিকাংশ সময়েই ছবি তুলতে সে আগ্রহী না - একবার মায়ের পেছনে গিয়ে লুকাচ্ছে, নয়ত সোফার পেছনে মুখ গুজে পড়ে আছে। তাকে জোর করে করে ক্যামেরার সামনে আনতে হয়েছে।

তারপর আবার প্রেগনেন্ট নায়লা। এবার একটি মেয়ে। পরবর্তি অনেকগুলো এলবাম শুধু এই মেয়েটির ছবিতেই ভর্তি। দেখলেই বোঝা যায় সে সপ্রতিভ। তার চোখে মুখে একটা সংকল্পের ছাপ, যেন সে যা করতে চায় তা না করে ছাড়ে না। ছোটবেলা থেকেই একটু টমবয়ের মত। মাঠে-জংগলে ছুটাছুটি করছে, ভাইকে টেনে টেনে তার সাথে নিয়ে যাচ্ছে, গাছে উঠছে, লেকে সাঁতার কাটছে। ছবি তুলতে পছন্দ করে। ভাই ছাড়া কিছু বোঝে না। জোর করে করে তার ভাইকে সব কিছুতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভাইটির আচার আচরণ দেখে মনে হয় সে তার বোনকে অসম্ভব ভালো বাসে। বোনের কোন অনুরোধ ফেলতে পারে না। মায়ের সাথেও তাদের দু'জনার অনেক ছবি। মিজান একরকম অদৃশ্য – খুব সম্ভবত সেই ছিল ক্যামেরা ম্যান।

শেষের এলবামটাতে দু'জনার পরিণত বয়েসের ছবি। ছেলেটা গ্রাজুয়েট হয়েছে। বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বোন ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মা কাঁদছে। ছেলেটা ভারী চশমা চোখে, সুদর্শন, গোবেচারা দর্শন। সে বোধহয় চাকরী পেয়েছে দূরে কোথাও। ছেলেটা চলে যাবার পর পরই বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়ে নায়লা। কারণ ছবির সংখ্যা হাতে গোনা। নায়লার শুষ্ক মুখের কয়েকটি ছবি আছে, কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই সে অসুস্থ নাকি স্রেফ মন খারাপ। মেয়েটির গ্রাজুয়েশনের কোন ছবি নেই। যার অর্থ সে হয়ত এখনও পড়াশুনা করছে কিংবা তার মায়ের অসুস্থতার কারণে তার গ্রাজুয়েশনে কেউ যায়নি। তারচেয়েও বড় প্রশ্ন হল, এই ভাই-বোন তাদের বাবার জীবন থেকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কেন? সে এলবামগুলোকে জায়গা মত গুছিয়ে রেখে নায়লার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মিজানকে জিজ্ঞেস করতে হবে। হতে পারে তাকে বিয়ে করায় রেগে গিয়ে বাবার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তারা। তেমনটি যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে দোষারোপ করতে পারবে না জুলেখা। মধ্য বয়স্ক বাবা এক জন অল্প বয়স্ক মহিলাকে বিয়ে করলে তার নিজেরও মেজাজ খারাপ হত। কিন্তু যাই হয়ে থাক, বাবা এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিল সে করাবে। মনে মনে সংকল্প করল। কাজটা অবশ্য সহজ হবে না। বিশেষ করে মিজানের সাথে গতকাল যে ঘটনাটা ঘটেছে, তার পর কথা বার্তাই বন্ধ হয়ে গেছে। দোষটা তার নয়। মাইকের মত একটা পাঁড় মাতালের জন্য লোকটার এতো মায়া কেন সে ঠিক বুঝতে পারছে না। কিন্তু এই জাতীয় মাতাল এবং ভবঘুরে মানুষ তার পছন্দ নয়। বিশেষ করে যাদের অন্য প্রাণীর প্রতি কোন মায়া মহব্বত নেই। তার হাতে ঐ লোকটির কখন কোন বিপদ হলে সে নিজেকে কোন

দোষারোপ করবে না।